بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
5

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার,7 এপ্রিল, 2016 28 জামাদি আস-সানি 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

হাজার হাজার মানুষ কেবল এই কারণে আমার বয়াত করিয়াছে যে, স্বপ্নে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে-এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার তরফ হইতে আগমণ করিয়াছে।

কেহ কেহ এই কারণে বয়াত করেন যে, তাহারা আঁ হযরত (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখেন এবং তিনি বলেন, পৃথিবী শেষ হইতে চলিয়াছে এবং এই ব্যক্তি খোদার শেষ খলীফা ও প্রতিশ্রুত মসীহ। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে কোন কোন আকাবের (বুযুর্গ ব্যক্তি) আমার জন্মের বা আমার সাবলক হওয়ার পূর্বেই আমার নাম লইয়া মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এখন আমি وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (সুরা আয্‌যোহাঃ আয়াত-১২) অর্থঃ- এবং (তোমার উপর) তোমরা প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তাহা তুমি প্রকাশ করিতে থাক-অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছি যে, খোদা তা'লা আমাকে ঐ তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ সকল নেয়ামত দান করিয়াছেন, যাহা আমার প্রচেষ্টায় নহে। বরং মাতৃগর্ভেই আমাকে দান করা হইয়াছে। আমার সমর্থনে তিনি ঐ সকল নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, যদি ঐগুলিকে এক এক করিয়া অদ্যকার তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করি তবে খোদা তা'লার কসম কাইয়া বলিতেছি যে, ঐগুলি তিন লক্ষেরও অধিক হইবে। কেহ যদি আমার কসমের উপর ভরসা না করে তাহাকে আমি প্রমাণ দিতে পারি। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে খোদা তা'লা সর্বক্ষেত্রে স্বীয় ওয়াদানুযায়ী আমাকে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এবং কতিপয় নিদর্শন এমন যে, তাহা সর্বক্ষেত্রে তাহার ওয়াদানুযায়ী আমার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা মিটাইয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ওয়াদা اِنِّيْ مُهِيْنٌ مَنْ اَرَادَ اِهَانَتَكَ (অর্থঃ নিশ্চয় আমি তাহাকে অপমানিত করিব যে তোমাকে অপমানিত করিতে চাহিবে-অনুবাদক) অনুযায়ী আমার উপর আক্রমণকারীদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়েরকারীদিগের উপর আমাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেইগুলি আমার আদিষ্ট হওয়ার সময় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কেননা, যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে কোন মিথ্যাবাদীর এই দীর্ঘ সময় লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। কোন কোন নিদর্শন যুগের অবস্থা দৃষ্টে উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ যুগ কোন ইমামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে বন্ধুদের অনুকূলে আমার দোয়া মঞ্জুর হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে অনিষ্টকারী দুশমনদের বিরুদ্ধে আমার বদদোয়া কার্যকর হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার দোয়ার মারাত্মক ব্যধিগ্রস্ত লোকেরাও আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের আরোগ্যের পূর্বেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার জন্য এবং আমর সত্যায়নের জন্য সাধারণভাবে খোদা পার্থিব ও অপার্থিব ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার সত্যায়নের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, যাহারা বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন, তাহারা স্বপ্নে দেখেন, আঁ হযরত (সাঃ) -কে স্বপ্নে দেখেন, যেমন সিন্ধুর বিখ্যাত গদ্দীনশীন পীর যাহার প্রায় এক লক্ষ মুরীদ ছিল এবং চাঁচড়া নিবাসী খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে হাজার হাজার মানুষ কেবল এই কারণে আমার বয়াত (অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে- অনুবাদক) যে, স্বপ্নে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে-এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার তরফ হইতে আগমণ করিয়াছে।

কেহ কেহ এই কারণে বয়াত করেন যে, তাহারা আঁ হযরত (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখেন এবং তিনি বলেন, পৃথিবী শেষ হইতে চলিয়াছে এবং এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম-অনুবাদক) খোদার শেষ খলীফা ও প্রতিশ্রুত মসীহ। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে কোন কোন আকাবের (বুযুর্গ ব্যক্তি) আমার জন্মের বা আমার সাবলক হওয়ার পূর্বেই আমার নাম লইয়া মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছেন। যেমন নেয়ামতউল্লাহ ওলী ও লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামের মিয় গোলাব শাহ্‌। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ, যাহার পরিধি প্রত্যেক জাতি, প্রত্যে যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইহা হইল মোবাহালার সিলসিলা (প্রার্থনা-যুদ্ধ-রীতি -অনুবাদক) ইহার অনেক নমুনা জগদ্বাসী দেখিয়া লইয়াছে। * আমি অনেক দেখার পর মোবহালার রীতি নজির পক্ষ হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং যে ব্যক্তি আমাকে প্রতারক এবং খোদা তা'লার নামে মিথ্যা রটনাকারী মনে করে এবং আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং খোদা তা'লার পক্ষ হইতে আমার প্রতি যে সকল ওহী হইয়াছে ঐগুলিকে আমার মিথ্যা রটনা মনে করে, সে মুসলমান হউক বা হিন্দু হউক বা আর্যসমাজী হউক বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হউক, তাহার অবশ্যই এই অধিকার আছে যে, সে নিজের নিজের পক্ষ হইতে আমাকে মোকাবিলায় রাখিয়া লিখিত মোবাহালা প্রকাশ করুক। অর্থাৎ খোদা তা'লার সম্মুখে এই অঙ্গীকার কতিপয় খবরের কাগজে প্রকাশ করুক যে, আমি খোদা তা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি আছে এই ব্যক্তি (এই জায়গায় স্পষ্টভাবে আমার নাম লিখিতে হইবে), যে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করে, সে প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাবাদী এবং এই সকল ইলহাম , যাহার কোন কোনটি সে এই পুস্তকে লিখিয়াছে, এইগুলি খোদার কথা নহে, বরং সবগুলিই তাহার বানানো কথা এবং আমার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও পূর্ণ চিন্তাভাবনার পর এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাহাকে আমি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যারটনাকারী, মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল মনে করি। অতএব, হে পরাক্রমশালী খোদা! যদি তোমার নিকট এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং মিথ্যাবাদী, মিথ্যারটনাকারী, কাফের ও বিধর্মী না হয় তবে এই মিথ্যারোপ ও অবমাননার জন্য আমার উপর কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর; অন্যথা তাহার উপর শাস্তি অবতীর্ণ কর। আমীন!

প্রত্যেকের জন্য কোন তাজা নিদর্শন চাওয়ার দরজা খোলা আছে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই মোবাহালার পর, যাহার সাধারণভাবে প্রচার করিতে হইবে এবং কমপক্ষে তিনটি নামকরা খবরের কাগজে ছাপাইতে হইবে, যদি এইরূপ ব্যক্তি, যে এই ব্যখ্যাসহ কসম খাইয়া মোবাহালা করে এবং ঐশী শাস্তি হইতে রক্ষা পায়, তবে আমি খোদার পক্ষ হইতে নহি। এই মোবাহালায় কোন মেয়াদকালের প্রয়োজন নাই। শর্ত এই যে, এইরূপ কিছু অবতীর্ণ হইবে যাহা হৃদয় অনুভব করিবে।

* প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরীর পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন কীভাবে নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবাহালা করে। সে নিজ পুস্তক" ফয়যে রহমানী" তে ইহা প্রকাশ করে। অতঃপর এই মোবাহালা কয়েক দিন পর সে মৃত্যু বরণ করিল। জম্মুর অধিবাসী চেরাগদীন নিজের পক্ষ হইতে আমার সাহিত মোবাহালা করে এবং লেখে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাহাকে খোদা ধ্বংস করিবেন। ইহার কয়েকদিন পর সে নিজের দুই ছেলে সহ প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া গেল।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৭০-৭২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মৌলভী গোলাম নবী সাহেব নিয়ায, মুবাল্লিগ ইনচার্জ জম্মু ও কাশ্মীর

দ্বিতীয় ভাগ

খিলাফতের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকার নির্দেশঃ মহানবী (সাঃ)-এর হাদিস এবিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, একসময় মুসলমান জাতি নিজেদের অপকর্মের কারণে খিলাফতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। আজ সারা মুসলিম বিশ্ব এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছে যে, খিলাফত ব্যতীত মুসলমান জাতি অসহায়। অথচ আল্লাহ তা'লা এবং তাঁর প্রিয় রসুল হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর প্রতিকারের জন্য খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তা'লা কুরান মজীদে বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْ অর্থাৎ তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমারা পরস্পর বিভক্ত হইও না। আল্লাহর রজ্জু প্রকৃত ইসলামী খিলাফতকেই বোঝায়। আঁ হযরত (সাঃ) বলেন,

اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِى اَبِى بَكْرٍ وَعُمَر فَاِنَّهُمَا حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدِ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَافَقَدْتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا"

(ইযালাতুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-৬৪)

অর্থাৎ আমার পর আবু বাকার (রাঃ) এবং উমর (রাঃ)-এর আনুগত্য কর, কেননা এরা দুজনে আল্লাহ তা'লার সেই দীর্ঘ রজ্জু, যে ব্যক্তি এই দুজনকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরবে সে বস্তুতঃ একটি অটুট বস্তুকেই আঁকড়ে ধরেছে।

খিলাফতে রাশেদার প্রতিষ্ঠাঃ

হযরত আকদস মহম্মদ (সাঃ) -এর তিরোধানের পর সাহাবাগণ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। এর পর হযরত হযরত উমর, হযরত উসমান গনী এবং হযরত আলি (রাঃ) পর্যায়ক্রমে খলীফা নির্বাচিত হন। মুসলমান জাতি এই সকল মহা সম্মানিত বুযুর্গগণের হাতে বয়াত গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং প্রকৃত ইসলামী খিলাফতকে তাদের নিজেদের প্রাণকেন্দ্র রূপে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়।

এই সকল খলীফাগণ যেরূপ মন-প্রাণ উজাড় করে একনিষ্ঠতার সঙ্গে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করে ইসলামকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন তা ইসলামের ইতিহাসের একটি সোনালী অধ্যায়। যদি ঐসকল বুযুর্গগণ না থাকতেন তবে ইসলামের চিত্র ঠিক কিরূপ হত তা ধারণা করা যায় না। ঐ সকল মহা সম্মানিত বুযুর্গগণের কারণে ইসলাম দৃঢ়তা অর্জন করে এবং আরবের দূর-দিগন্ত অতিক্রম করে দেশান্তরকে আলোকিত করে তোলে।

খিলাফতে রাশেদার সময়কাল ত্রিশ বছর ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, الخلافة ثلاثون سنة অর্থাৎ খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফিতান, পৃষ্ঠা-৪৬৩)

খিলাফতে রাশেদার পর ইসলাম যে অধঃপতন এবং পশ্চাদগামীতার যুগ অতিক্রম করবে সে বিষয়ে আল্লাহ তা'লা হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে পূর্বেই অবগত করেছিলেন। এই কারণে তিনি (সাঃ) মুসলমান জাতিকে পূর্বেই শুভ সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সেই জাতি কখনো ধ্বংস হতে পারে না যার অগ্রভাগে আমি রয়েছি এবং পশ্চাদভাগে মসীহ মওউদ থাকবেন।

(কুনযুল আমাল, পৃষ্ঠা-১০৪)

তিনি (সাঃ) মুসলমান জাতির সংশোধনের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(মিশকাত, পৃষ্ঠা-৩৬)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা এই জাতির সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করতে থাকবেন যারা ধর্মের সংস্কার করবেন এবং ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবেন।

অতএব আঁ হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অনুরূপভাবেই মুসলমান জাতির সংশোধনের জন্য তেরো শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মের সংস্কারের কাজ অব্যাহত থাকে এবং চোদ্দ শতাব্দীতে ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ-এর আগমণ নির্ধারিত ছিল, যিনি যথাসময়ে আগমণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের যুগ আরম্ভ হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে , ইনশাল্লাহ॥

তবে এরই সঙ্গে আল্লাহ তা'লা খিলাফতের যে অঙ্গীকার করেছেন তার সঙ্গে মুমেনীনদের সৎ কর্মের শর্ত বেঁধে দিয়েছেন। এর পরিস্কার অর্থ হল, যখন সৎ কর্ম থাকবে না তখন মুসলমান জাতি খিলাফতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেরূপ খিলাফতে রাশেদার প্রথম যুগের পর হয়েছিল। আল্লাহ তা'লা করুন তিনি যেন খিলাফতের এই নিয়ামত আমাদের মাঝে চির বিরজমান রাখেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কিছু চিত্তাকর্ষক উদাহরণঃ

হযরত মহানবী (সাঃ) বলেন,আমার জাতির উপমা সেই বৃষ্টির ন্যায় যার প্রথম ভাগ বেশি কল্যানের অধিকারী না কি অন্তিমভাগ বেশি কল্যাণের অধিকারী তা বলা যায় না। এই হাদিসের শেষে তিনি (সাঃ) বলেন, সেই জাতি কিভাবে ধ্বংস হতে পারে যার অগ্রভাগে আমি রয়েছি এবং শেষ ভাগে মসীহ মওউদ (আঃ)।

তিনি (সাঃ) শেষ যুগ সম্পর্কে এও বলেছিলেন,

" অর্থাৎ এই জাতির শেষভাগে এমন একটি জামাত হবে যারা সাহাবাদের ন্যায় প্রতিদান পাবেন এবং তারা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ থেকে বিরত রাখবে। এই জামাতের লোকেরা সমস্ত নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদেরকে পরাস্ত করবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফিতান, পৃষ্ঠা-৪৮৫)

স্পষ্টতই হাদিসে বর্ণিত জামাতের সত্যায়নকারী একমাত্র মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামাত-ই হতে পারে এবং আঁ হযরত (সাঃ) এই জামাতের সম্পর্কেই এই নিয়ামত পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যাকে ভিন্ন বাক্যে খিলাফত আলা মিনহাজুন্নাবুয়্যত বলা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেন,

অনুবাদঃ " হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার নবুয়্যত তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'লা সেটিকে উঠিয়ে নিবেন। এর পর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ সেটিকেও উঠিয়ে নিবেন। এরপর দখলের রাজত্ব আসবে যতদিন পর্যন্ত খোদা তা'লা চাইবেন। অতঃপর অত্যাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'লা সেটিকেও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর মহানবী (সাঃ) নীরব হয়ে রইলেন।"

উক্ত হাদিসে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের দু'টি যুগ হবে। একটি আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর আসে। দ্বিতীয়টি হবে মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যুগ। যেরূপ হাদিসের ব্যাখ্যা কারীগণ লিখেছেন,

"اَلظَّاهِرُ اَنَّ الْمُرَادَ بِهٖ زَمَنُ عِيْسٰى وَالْمَهْدِيِّ"

(মিশকাত)

অর্থাৎ হাদিসের শেষে 'নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত' বলতে মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যুগকে বোঝানো হয়েছে। নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত বলার পর মহা নবী (সাঃ) নীরব ছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পর খিলাফতের যুগ কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠাঃ

ঐশী গ্রন্থাবলী এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যথাসময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে আল্লাহ তা'লা কাদিয়ানের পবিত্রভুমিতে আবির্ভূত করেছেন। তিনি (আঃ) ১২৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৯০ সালে ঐশী বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে যুগের সংস্কারক হওয়ার দাবী করেন এবং ১৮৯০-এর শেষে মসীহ মওউদ হওয়ার ঘোষণা করেন। ২৬ শে মে, ১৯০৮ সালে তিনি (আঃ) মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই ওসীয়্যত অনুসারে খিলাফতের নির্বাচন হয়। এবং হযরত মৌলান হাকীম মৌলানা নুরুদ্দীন (রাঃ)-এর হাতে জামাতের সদস্যগণ বয়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্বিতীয় কুদরতের সত্যায়নকারী হন।

চিরন্তন খিলাফতের শুভ সংবাদ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই জামাতকে দান করেছিলেন। হুযুর (আঃ) ২৪ ডিসেম্বর, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক 'আল-ওসিয়্যত'-এ দ্বিতীয় কুদরতের ব্যাখ্যা করে বলেন,

" সেই সময় আল্লাহ তা'লা হযরত আবু বাকার (রাঃ)-কে দাঁড় করিয়ে পুনরায় স্বীয় শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন এবং পতনুন্মুখ ইসলামকে রক্ষা করেন। (আল-ওসিয়্যত)

এরপর আটের পাতায়

জুমআর খুতবা

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দ্বারা বর্ণিত কতিপয় শিক্ষনীয় ঘটনার উল্লেখ।

এটি অবশ্যই বৈধ, বিচারের জন্য মানুষ আদালতে যেতে পারে কিন্তু যদি সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়, আলাপ অলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাহলে আদালতেরও স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত নয় আর হঠকারিতা দেখানো উচিত নয়।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক এবং তাদের কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু অনেক যুবক এমন আছে যারা পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না আর তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়েও যত্নবান নয়।

কুরআন সম্পর্কে প্রণিধান করা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত। এছাড়া হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে তফসীর লিখেছেন সেটিও পড়া উচিত। এছাড়া কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে খলীফাদেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে বা তফসীর রয়েছে তাও দেখা উচিত। সেই সাথে নিজেদেরও ভাবা উচিত, আর কুরআন থেকেই জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডার উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত।

জ্ঞানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীতে এর অনেক মূল্য রয়েছে।

একজন আহমদী হিসেবে আমাদের ঈমানের হিফাযত তখনই সম্ভব যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে আমাদের দৃঢ় এবং অটুট সম্পর্ক থাকে। আর এর জন্য সেই সব মাধ্যমগুলোও কাজে লাগানো উচিত যার কল্যাণে দূরে বসেও এই সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুন্ন থাকতে পারে।

আজকাল এমটিএ এবং অনুরূপভাবে 'আল ইসলামের' যে ওয়েবসাইট রয়েছে, জামাতি ওয়েবসাইট, এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম আর সকল আহমদীর তরবীয়ত এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম। সুতরাং সব আহমদীর উচিত এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা।

বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের জন্য এমন মানুষ খুঁজে বের করা উচিত, যাদের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত, যারা রীতিমত নামায পড়ে বা নামাযে অভ্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

রাবওয়ার নাগরিকদের এদিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। যারা দুর্বল রয়েছে তাদের উচিত তারা যেন দুর্বলদের প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে জামাতের সাথে যাদের দৃঢ় সম্পর্ক আছে এবং যারা রীতিমত নামাযও পড়ে তাদের প্রভাব গ্রহণ করা।

শেখুপুরা জেলার অধিবাসী মুকাররম মহম্মদ আলি সাহেবের পুত্র মুকাররম কামরুল জিয়া সাহেবের শাহাদত বরণ।

শহীদ মরহুমের সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৪ আমান,১৩৯৫ হিজরী শামসী

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত কিছুকাল যাবৎ কতিপয় জুমুআর খুতবায় আমি কতক ঘটনা অথবা শিক্ষনীয় গল্প উপস্থাপন করেছি যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। আজও যখন আমি এ সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনার জন্য নির্বাচন করেছি তখন আমার মনে পড়লো যে, পাক-ভারতের এসব পুরোনো কাহিনী বা গল্প বা ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, এসব গল্প বা ঘটনাবলী আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই চলমান রয়েছে। যদি জামাতের বই-পুস্তকে এগুলো সংরক্ষিত না হতো তাহলে অনেক আগেই তা কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত আর আধুনিক যুগের কেউ এসব ঘটনা সম্পর্কে জানতই না। আজ বেশ কয়েকটি ভাষায় এগুলোর অনুবাদ হয়। যাই হোক আমি যেভাবে বলেছি আজও সেই ধারাবাহিকতায় আমি কিছু গল্প বা কাহিনী উপস্থাপন করবো। আর এগুলো কেবল বা নিছক কাহিনী নয় বরং কিছু বাস্তব ঘটনাও বটে, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই প্রেক্ষাপটে কিছু নসীহত করেছেন। কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা বাহ্যত কৌতুক কিন্তু তাতেও তিনি (আ.) কতিপয় সংশোধনের দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এমনই একটি কৌতুক রয়েছে যা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক মালিনীর দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন যে, তার দুই কন্যা ছিল। একজনের বিয়ে হয়েছিল কুমারদের ঘরে আর দ্বিতীয় জনের বিয়ে হয় মালির ঘরে। যখনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতো সেই মহিলা উন্মাদের মতো ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় ছুটে বেড়াত। মানুষ জিজ্ঞেস করতো যে, হয়েছে কি? সে বলতো যে, আমার এক মেয়ে আর নেই। কেন? সে বলতো যে, বৃষ্টি হলে কুমারদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা তাদের ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে মালীদের ঘরে যার বিয়ে হয়েছে সে আর থাকবে না কেননা বৃষ্টি না হওয়ার কারণে তাদের ফসল বা সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হবে না। যাহোক বৃষ্টি হলে কুমারদের তৈরি বাসন বা আসবাবপত্র নষ্ট হবে আর বৃষ্টি না হলে সবজি উৎপাদনকারীদের সবজি ইত্যাদির ক্ষতি হবে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১১)

বাহ্যত এটি সামান্য একটি কথা কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই প্রেক্ষাপটে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, কাদিয়ানের দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর মতভেদ হয় বা কোন ঝগড়া বিবাদ হয়। বন্ধুরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু তাদের উভয়েই এটি বলে যে, আমরা ইংরেজ সরকারের আদালতের স্মরণাপন্ন হবো এবং তাদের দ্বারাই সিদ্ধান্ত করাবো। এইভাবে আর তারা বিচার বিভাগে একে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করে। যখনই মামলার শুনানি হতো তারা দুই জনই স্বয়ং বা তাদের কোন প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকাশে উপস্থিত হয়ে দোয়ার অনুরোধ জানাত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, উভয়েই আমার মুরীদ এবং ভক্ত, তাদের উভয়ের সাথেই সম্পর্ক আছে, এখন কার জন্য হেরে যাওয়ার দোয়া করবো আর কার জন্য জয়ী হওয়ার দোয়া করবো। আমি তো এটিই দোয়া করি যে, তাদের মাঝে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে-ই যেন জয়যুক্ত হয়।

আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এখনও আহমদীরা যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগে বা আদালতে মামলা করে তখন একই সাথে তারা আমার কাছেও দোয়ার জন্যও লিখে। এভাবে দোয়ার জন্য বলাতো তেমনই যেমন বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। হয় কুমারদের

ঘরে যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে অথবা মালীর ঘরে যার বিয়ে হয়েছে তার ক্ষতি হবে। একজন তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখানে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কেউ যেন আবার এটি মনে না করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেহেতু মামলাবাজি হতো তাই আজও এমনটি হলে কোন অসুবিধা নেই বা এটি বৈধ। এটি অবশ্যই বৈধ, বিচারের জন্য মানুষ আদালতে যেতে পারে কিন্তু যদি সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয়, আলাপ অলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাহলে আদালতেরও স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত নয় আর হঠকারিতা দেখানো উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই আচরণ বা এই দৃষ্টান্ত পছন্দ করেননি। তাই নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন ভালো নয় এবং হঠকারিতা বর্জন করা উচিত আর দোয়ার অনুরোধ করে ইমামকেও সমস্যা বা কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। উভয় পক্ষই যদি আহমদী হয় তাহলে কার জন্য দোয়া করবেন আর কার জন্য করবেন না। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে দোয়া করেছিলেন আমিও সেই দোয়াই করি, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যার ন্যায্য অধিকার তুমি তাকেই দান কর।

আল্লাহ্ তা'লা একটি কথার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর তা হলো, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়া বা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর গন্ডি ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা উচিত, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা উচিত। যখন ধর্মীয় বিষয় আসে বা ধর্মের প্রশ্ন আসে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি বলা যেতে পারে যে, আমি অবশ্যই আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু এটি যেহেতু খোদার অধিকারের প্রশ্ন তাই এই কথা মানা আমার জন্য কঠিন, আমি নিরুপায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক এবং তাদের কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু অনেক যুবক এমন আছে যারা পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না আর তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়েও যত্নবান নয় বরং সন্তান সন্ততির মাঝে কেউ যদি কোন ভালো পদে নিযুক্ত হয় বা ভালো পদবী পায় তাহলে সে নিজের দরিদ্র পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতেও লজ্জা অনুভব করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুনাতেন যে, কোন এক হিন্দু বড় কষ্ট করে তার ছেলেকে বি এ এবং এম এ পাশ করিয়েছে আর সেই ডিগ্রি লাভের পর সে ডেপুটি নিযুক্ত হয় এবং দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যায়। সে যুগে ডেপুটি পদে নিযুক্ত হওয়া অনেক বড় সম্মানের কারণ ছিল, যদিও আজকের যুগে এটিকে খুব একটা বড় পদ বলে মনে করা হয় না। একদিন তার পিতার মনে এই বাসনা জাগে যে, আমার ছেলে ডেপুটি নিযুক্ত হয়েছে, আমিও তার সাথে দেখা করে আসি। এরপর সেই হিন্দু যখন তার সন্তানের সাথে দেখা করার জন্য তার মজলিস বা বৈঠকে পৌঁছে সেই সময় তার কাছে উকিল এবং ব্যারিস্টাররা উপবিষ্ট ছিল। তার পিতাও নিজের নোংরা ধূতি পরিহিত অবস্থায় এক কোণে বসে যায়, কথাবার্তা চলতে থাকে। তার সেখানে বসা মজলিসের কোন এক ব্যক্তির পছন্দ হয়নি, সে জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের এই বৈঠকে বা মজলিসে এই ব্যক্তি কে বসে আছে? ডেপুটি সাহেব তার কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হয় আর লজ্জা এড়ানোর জন্য বলে যে, এ ব্যক্তি আমাদের ভৃত্য অর্থাৎ আমাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করেন। তার পিতা এই কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠেন এবং নিজের চাদর গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন যে, জনাব আমি তার ভৃত্য নই বরং তার মায়ের ভৃত্য। অবশেষে মানুষ যখন জানতে পারে যে, ইনি ডেপুটি সাহেবের পিতা তখন তারা অনেক অভিযোগ-অনুযোগ করে যে, যদি আমাদেরকে পূর্বেই জানিয়ে দিতেন যে, তিনি আপনার পিতা তাহলে আমরা তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতাম, তাকে শ্রদ্ধার সাথে বসাতাম। যাহোক এ ধরণের দৃশ্য চোখে পড়ে যে, আত্মীয় স্বজন যদি দরিদ্র হয় তাহলে মানুষ তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে দ্বিধা প্রকাশ করে, তা তিনি পিতাই হোন বা অন্য যে-ই হোক না কেন,যেন কোথাও তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়। এক কথায় পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, মানুষ তাদেরকে এড়িয়ে চলে। আর পিতা-মাতার নাম সমুজ্জ্বল করা তো দূরের কথা বরং তারা তাদের নামকে কলঙ্কিত করে ।

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৩ থেকে সংকলিত)

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন যে, কতক আলেম বা বক্তাদের বক্তৃতা মানুষ সাময়িক উপভোগ করার জন্য শুনে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ সম্পর্কে বলেছেন যে, বৈঠকে কেবল এজন্য আসবে না যে, অমুক ব্যক্তি সুবক্তা তাই তার বক্তৃতা শুনবো বরং এটি দেখ যে, সেই বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে আর তা থেকে কিভাবে লাভবান হওয়া যায়। যাহোক কিছু মানুষ বক্তার কথার গভীরতাও অনুধাবন করে না আর তাদের বক্তৃতাও বুঝে না আর বক্তার কথার উদ্দেশ্য কি তাও বুঝতে পারে না বরং শুধু সাময়িক উপভোগের জন্য বসে থাকে। একইভাবে কতক বক্তাও সাময়িক আবেগ সৃষ্টির জন্য জোরালো বক্তৃতা করে বা করার চেষ্টা করে আর বিভিন্ন প্রকার আওয়াজও বের করে এবং কৃত্রিমভাবে আবেগ সৃষ্টির বা মানুষের মন গলানোরও চেষ্টা করে। এমনই এক বক্তার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বক্তার কথা বলতেন। সেই ব্যক্তি বক্তৃতার জন্য দন্ডায়মান হয় আর তার বক্তৃতার বিষয়বস্তুও ছিল বড়ই আবেগ সঞ্চারী। এক ব্যক্তি সেখানে আসে এবং দন্ডায়মান হয়। সে কৃষক ছিল আর তার হাতে ছিল একটি 'তরংড়ি' যা ফোর্ক বা কাটা চামচের মতো তিন শাখা বিশিষ্ট ও দীর্ঘ এবং এর একটি হাতলও হয়ে থাকে আর এটি গম পৃথক করার পর খড়ি ইত্যাদি উঠানোর জন্য ব্যবহার হয়। পূর্বে অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে পাশ্চাত্যেও এটি ব্যবহার হতো। যাহোক সে গ্রাম থেকে আসে এবং বক্তৃতা শুনার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে যত লোক বসে ছিল তাদের ওপর এই বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু সেই কৃষক কিছুক্ষণ পরই ক্রন্দন আরম্ভ করে। সেই বক্তার ধরা পড়ার ছিল তাই তার হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা দানা বাধে। সে ধরে নেয় যে, আমার বক্তৃতায় এই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছে। সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, দেখ! মানুষের হৃদয়ও বহু প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার হৃদয়ের অধিকারী হলে তোমরা যারা ঘন্টার পর ঘন্টা আমার বক্তৃতা শুনছো কিন্তু তোমাদের হৃদয় আদৌ এতে প্রভাবিত হয়নি আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র এই বান্দাকে দেখ, তার ওপর তাৎক্ষনিকভাবে বক্তৃতার প্রভাব পড়ে। সে মাত্র কিছুক্ষণ আগে এসে দন্ডায়মান হয় এবং কাঁদা আরম্ভ করে। এরপর তার ওপর যে, কত গভীর প্রভাব পড়েছে তা মানুষের সামনে প্রকাশের জন্য সে সেই কৃষককে জিজ্ঞেস করে যে, মিঞাঁ! কোন কথা তোমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তুমি কেঁদে উঠলে? যারা পুরোনো কৃষক তারাই এটিকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে, সে বললো, গতকাল আমার বাছুরটি এভাবেই গলার আওয়াজ বের করতে করতে মরে যায়, আপনার আওয়াজ শুনে আমার সেই বাছুরের কথা মনে পড়ে যায়, তাই আমি কেঁদে উঠি। এই কথা শুনে সেই বক্তা খুবই লজ্জিত হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭ থেকে সংকলিত)

তো সেই কৃষক আবেগ আপ্লুত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই বক্তার কয়েকবার উচ্চস্বরে কথা বলার কারণে আর কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম আবেগ প্রকাশ করার জন্য গলা থেকে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ বের করার কারণে কৃষকের নিজ বাছুরের কথা মনে পড়ে যায় যার গলা থেকে মৃত্যুর সময় এমনই আওয়াজ বের হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে সেই বক্তা সাহেব এই আত্মপ্রসাদ নেন যে, হয়তো আমার বিগলিত চিত্তের বক্তৃতা শুনেই এই ব্যক্তি কেঁদে উঠেছে। কিন্তু তার লোক দেখানো ভাব এবং কৃত্রিমতা প্রকাশ পেতে বেশি সময় লাগেনি। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মৌলভীরা বড় বড় বুলি আওড়ায় তাদের বক্তৃতা শুনলেও প্রায় সময় দেখবেন যে, তাদের গলা থেকেও অবিকল এমন আওয়াজই বের হয় বা শোনা যায়। যাহোক এটি তাদের কাজ, বিশেষকরে যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাদের মাঝে উন্মাদনা কাজ করে। যারা পাকিস্তানে থাকেন বা যারা সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে এসেছেন তারা ভালো বুঝতে পারবেন আর যারা এমন বক্তৃতা শুনেছেন তারা জানেন যে, মৌলভীদের বক্তৃতা কেমন হয়ে থাকে।

আমাদের প্রতি খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সৌভাগ্য পেয়েছি নতুবা ইসলামের নামে পীর ফকিররা যে ব্যবসা আরম্ভ করেছে আজকে আমরাও হয়তো তাদেরই অংশ হতাম। এই পীর সাহেবরা দাবি করে যে, তারা অনেক উন্নত মার্গের মানুষ। তারা বলে যে, আমরা দোয়ার মাধ্যমে আমাদের চাহিদা পূরণ করি, আমাদের আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গভীর নৈকট্য রয়েছে, দুনিয়ার প্রতি আমরা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। কিন্তু এদের কর্ম কি, এদের আমলের স্বরূপ দেখুন। এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন, নিজের সম্পর্কে সেই ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, সে অনেক উচ্চ মার্গে উপনীত। একবার এক মুরীদের ঘরে যায় এবং বলে যে, আমার ট্যাক্স নিয়ে আস অর্থাৎ আমাকে নযরানা দাও। তখন দুর্ভিক্ষ ছিল, মুরীদ বা ভক্ত বলে যে, এখন কিছুই নেই, এবার আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু পীর সাহেব দীর্ঘ সময় বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থেকে অবশেষে তার কোন জিনিস বিক্রি করিয়ে তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তারপর সেখান থেকে বের হয়। তো এমন সব নোংরামি আর দুর্বলতা এদের মাঝে দেখা যায় যারা

বড় বড় দাবি করে যে, আমরা অনেক উচ্চ মার্গে পৌঁছে গেছি।

(যিকরে ইলাহী, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৯৪-৪৯৫)

এগুলো অতীতের কোন বিষয় নয় আজও পাকিস্তান বা এ ধরণের দেশে এমন পীর রয়েছে। কুরআন শরীফে প্রজ্ঞা এবং তত্ত্বজ্ঞানের যে বিবরণ রয়েছে তা জ্ঞানের সকল দিককে পরিবেষ্টন করে আছে। অবশ্য এটি ভিন্ন কথা যে, আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বা চিন্তা ভাবনার অভাবে এর গভীরে অবগাহনের যোগ্যতা আমরা রাখি না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমার মনে আছে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল নীতি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন শরীফে বিদ্যমান। তিনি বলেন, কুরআন সম্পর্কে আমি হয়তো সেভাবে প্রণিধানের সুযোগই পাইনি বা আমার তত্ত্বজ্ঞান হয়তো এখনও সেই মার্গে পৌঁছেনি কিন্তু যতটাই তত্ত্বজ্ঞান আমার রয়েছে তার আলোকে আর জেষ্ঠ্যদের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, কুরআনের বাইরে আর কোন জিনিসের আমাদের প্রয়োজন নেই।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৩)

সুতরাং কুরআন সম্পর্কে ভাবা উচিত বা প্রণিধান করা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে তফসীর লিখেছেন তাও পড়া উচিত। এছাড়া কোন কোন আয়াতের ব্যাপারে খলীফাদেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে বা তফসীর রয়েছে তাও দেখা উচিত। সেই সাথে নিজেদেরও ভাবা উচিত আর কুরআন থেকেই জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডার উদঘাটনের চেষ্টা করা উচিত।

কেউ কেউ মনে করে যে, আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি আর তাই যথেষ্ট। অন্য কোন কিছুর আমাদের প্রয়োজন নেই, কোন অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন নেই। অন্য কারও কাছ থেকে কোন পরামর্শ নেয়ারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্মরণ রাখার বিষয় হলো, জ্ঞানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি শুধু বই-পুস্তক পড়ে ডাক্তার হতে চায় তাহলে এটি খুব কঠিন বিষয় বরং অসম্ভব বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞের সামনে রোগীদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা আবশ্যক। যদি কেউ ডাক্তার হয় এবং বই-পুস্তক পড়ে থাকে তাহলে এরপর তার কোন বিশেষজ্ঞের সাথে রোগ নির্ণয় এবং রোগীর চিকিৎসা করাও আবশ্যক হয়ে থাকে। এ কারণেই কলেজে ডাক্তারদেরকে পড়ানোর পাশাপাশি তাদের প্র্যাক্টিক্যালও হয়ে থাকে কেননা তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও হওয়া চাই। যদি এটি না হয় তাহলে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না আর কিছুই শেখা সম্ভব হয় না। সেইসাথে এরপরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়ে থাকে, শুধু পড়ালেখা চলাকালেই অভিজ্ঞতা অর্জন করলে হবে না বরং পরবর্তীতেও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। যাহোক কোন চিকিৎসক বা ডাক্তারের চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান তখনই উৎকর্ষ লাভ করবে যদি সে রোগী দেখতে থাকে। যদি তা না করে তাহলে কেবলমাত্র জ্ঞান উপকারী হতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জ্ঞান এবং কর্ম সম্পর্কে বলতেন যে, এক চিকিৎসক ছিল যে অনেক বড় পন্ডিত ছিল। সে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভালো জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার অধ্যয়ন ছিল অনেক ব্যাপক। রাজা রঞ্জিত সিংয়ের খ্যাতির কথা শুনে সে দিল্লী থেকে পদোন্নতির আশায় তার দরবারে পৌঁছে। রঞ্জিত সিংয়ের মন্ত্রী ছিল একজন মুসলমান, সে এই চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে। সেই চিকিৎসক তখন মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করে যে, মহারাজাকে সাক্ষাতের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ করা হোক। সে বলে যে, আমি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। মন্ত্রীর তখন এই আশঙ্কা হয় যে, যদি এর প্রভাব বৃদ্ধি পায় তাহলে কোথাও না আবার আমার প্রভাব হারিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ না করাকেও সে সততা ও মানবতা পরিপন্থী বলে মনে করে। এছাড়া ডাক্তারের কথায় সে এটিও বুঝতে পেরেছিল যে, এর ব্যবহারিক কোন অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। এরপর মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের দরবারে মন্ত্রী সেই ডাক্তারের জন্য সুপারিশ করে এবং বলে যে, হুযূর! ইনি অনেক বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, অমুক অমুক কিতাব পড়েছেন। মন্ত্রী তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করে। মহারাজা রঞ্জিত সিং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমাকে বলো যে, ইনি চিকিৎসা করেছেন কিনা বা তার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আছে কিনা। মন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, হুযূরের কল্যাণে অভিজ্ঞতাও হয়ে যাবে,আপনার ওপরেই তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। রঞ্জিত সিং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান অর্থহীন। তিনি বলেন যে, অভিজ্ঞতার জন্য বেচারা রঞ্জিত সিংই রয়ে গেছে, তাই ডাক্তার সাহেবকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮-১৯)

সুতরাং জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও একান্ত আবশ্যক, আর পৃথিবীতে এর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। যে কোন কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের পর যদি প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা না হয় তাহলে অনেক এমন বাধা বিপত্তি সামনে আসে যখন কাজ করতে গিয়ে মানুষ বুঝে উঠতে পারে না যে, কি করনীয়। মানুষ তখন অচল হয়ে যায় আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যেই সমস্যা বা বাধা বিপত্তি সামনে থাকে তা দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কেবল জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যদি নিজেকে কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা আরম্ভ করে তাহলে সে রঞ্জিত সিংয়ের উত্তরই পাবে।

জামাতের সার্বিক উন্নতির জন্যও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর বর্তমান যুবক শ্রেণীর আধুনিক জ্ঞান অর্জনের পর তার অভিজ্ঞতাও অর্জন করা উচিত আর অভিজ্ঞ লোকদের সাথে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জামাতের কল্যাণে সেটিকে ব্যবহার করা উচিত। অনেকেই এই পরামর্শ দেয় যে, নতুন প্রযুক্তি আছে এটি ব্যবহার করা উচিত বা এটি করতে হবে। অনেক সময় জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত তো ঠিক আছে কিন্তু কিছু বিষয়াদি বা সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূরীভূত করা আবশ্যক হয়ে থাকে অথবা এমন সব প্রতিবন্ধকতাও সামনে আসতে পারে যা সম্পর্কে চিন্তা করা বা ভাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে আর অভিজ্ঞরা এটি খুব ভালো বুঝবে।

একজন আহমদী হিসেবে আমাদের ঈমানের হিফাযত তখনই সম্ভব যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে আমাদের দৃঢ় এবং অটুট সম্পর্ক থাকে। আর এর জন্য সেই সব মাধ্যমগুলোও কাজে লাগানো উচিত যার কল্যাণে দূরে বসেওএই সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুন্ন থাকতে পারে। এক জায়গায় এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামাতী বিষয়ে সদস্যরা কখনও উন্নতি করতে পারবে না বরং তারা জীবিতই থাকতে পারবে না যতক্ষন মূলের সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকবে। আর এই যুগে এই সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম উপায় হলো পত্র-পত্রিকা। মানুষ যেখানেই বসে থাকুক না কেন যদি জামাতের পত্র-পত্রিকা তার কাছে পৌঁছতে থাকে তাহলে এটি পাশে বসে থাকারই নামান্তর। এর দৃষ্টান্ত এমনই যেমন কিনা এখন আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। তিনি (রা.) বলেন, যেমন এখন মহিলাদের জলসা হচ্ছে আর মহিলারা লাউড স্পিকার বা মাইকের মাধমে বক্তৃতা শুনছে। যদি মাইকের মাধ্যমে তাদের কাছে আওয়াজ না পৌঁছতো বা তাদের কর্ণগোচর না হতো তাহলে তারা কিছুই বুঝতে পারতো না যে, কি বলা হচ্ছে। লাউড স্পিকার বা মাইক মহিলাদেরকে আমার বক্তৃতার নিকটতর করেছে। এখানেও লাউডস্পিকার বা মাইকের মাধ্যমে মহিলাদের হলে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আর তারা শুনতে পাচ্ছে, তো এটিও এক ধরণের নৈকট্য।

অনুরূপভাবে পত্র-পত্রিকা দূরে বসবাসকারীদেরকে জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সবসময় বলতেন যে, আল-হাকাম এবং বদর হলো আমাদের দু'টো বাহু। যদিও অনেক সময় এই পত্রিকাগুলো এমন সংবাদও ছেপে দিতো যা ক্ষতিকর হতো কিন্তু এর উপকারিতা যেহেতু ক্ষতি থেকে অধিক ছিল তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, আমাদের এমন মনে হয় যেন এই দু'টো পত্রিকা আমাদের দু'টো বাহু। এখানে দু'টো বাহু হওয়ার অর্থ হলো এর মাধ্যমে আমাদের যে বাহু রয়েছে অর্থাৎ জামাত তা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বন্ধুদের জামাতের পত্র-পত্রিকার প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল অথচ তখন জামাত আজকের তুলনায় এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ হবে। আর আজকে তো শতভাগ বা হাজার ভাগের এক ভাগ হবে। বদরের গ্রাহক সংখ্যা এক সময় চৌদ্দ থেকে পনের শতকে পৌঁছে যায় কিন্তু এরপর তা কমতে থাকে। একইভাবে আল-হাকামের গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। জামাতের বন্ধুরা সেই যুগে পত্র-পত্রিকা অনেক বেশি ক্রয় করতেন। এমনকি যারা শিক্ষিত ছিল না তারাও পত্রিকা ক্রয় করে অন্যদেরকে পড়ার জন্য দিতো, আর মনে করতো যে, এটিও তবলীগের এক মাধ্যম।

(আনোয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪৪-৫৪৫)

বরং এক আহমদী টমটম গাড়ি চালাতেন, তিনি খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি আল-হাকাম আনিয়ে টমটম গাড়িতে বা ঘোড়ার গাড়িতে রেখে দিতেন আর যখন তার টমটম গাড়ীতে করে প্যাসেঞ্জার বা আরোহী নিয়ে যেতেন তখন চেহারা দেখে যদি বুঝতে পারতেন যে ইনি ভদ্র মানুষ

তাহলে তাকে পত্রিকা দিয়ে বলতেন যে, এই পত্রিকাটি এসেছে, আমাকে একটু পড়ে শুনান। আর এভাবে আরোহী বা প্যাসেঞ্জার যখন নিজ গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামত তখন নামার পূর্বে নাম ঠিকানা নোট করে নিত আর এভাবে জামাতের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন হতো আর বয়আতও হতো। মানুষ বলতো যে, তিনি অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আর টমটম গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী চালানো সত্ত্বেও তার এলাকায় সবচেয়ে বেশি বয়আত করিয়েছেন। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা আরো অনেক সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের তরবীয়ত এবং খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সব আহমদীর প্রধানত এমটিএ শোনা আবশ্যক, এমটিএ শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। দ্বিতীয়ত তবলীগের জন্য এমটিএ এবং ওয়েবসাইটের যে সমস্ত প্রোগ্রাম রয়েছে তাও বন্ধুদের জানানো উচিত, অনেক সময় বন্ধুদের সাথে বসে সেগুলো দেখার সুযোগ হয়, তাই বন্ধু-বান্ধবদের এ সম্পর্কে বলা উচিত বা পরিচিত করানো উচিত। আমার কাছে এখনও এমন অনেক পত্র আসে যাতে মানুষ লিখে যে, যখন থেকে এমটিএ-তে অন্ততপক্ষে রীতিমত খুতবা শোনা আরম্ভ করেছি তখন থেকে জামাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছে এবং আমাদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করছে। সুতরাং আজকাল এমটিএ এবং অনুরূপভাবে 'আল ইসলামের' যে ওয়েবসাইট রয়েছে, জামাতি ওয়েবসাইট, এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম আর সকল আহমদীর তরবীয়ত এবং খিলাফত ও জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম। সুতরাং সব আহমদীর উচিত এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করা।

অনেকেই চায় যেন তাদের সংশোধন হয়, তারা যেন ইসলামী আদেশ-নিষেধ মেনে চলার আগ্রহ রাখে, বিশেষ করে নামায সম্পর্কে তাদের আগ্রহ থাকে যেন রীতিমত নামায পড়ার সুযোগ হয়। কিন্তু এরপর তারা এমন মানুষের সাহচর্যে এসে যায় যারা অলস, এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরাও নামাযের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আলস্যের শিকার হয় আর অবচেতন মনেই এমনটি ঘটতে থাকে। সুতরাং বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের জন্য এমন মানুষ খুঁজে বের করা উচিত, যাদের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত, যারা রীতিমত নামায পড়ে বা নামাযে অভ্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যেখানে একটি ছোট জায়গায় আহমদীদের অনেক ঘন বসতি রয়েছে আর সেখানে মসজিদগুলোও একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব অতি স্বল্প। তাই তাদের মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা উচিত। অনুরূপভাবে অনেকেই এমন আছে যারা জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী রাখে, তাদেরকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। অনেক সময় মানুষ যখন বাহির থেকে সেখানে যায় তখন তারা এ সম্পর্কে আমাকে লেখেও আর অভিযোগও করে যে, রাবওয়ার লোকদেরও যথাযথভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং রাবওয়ার নাগরিকদের এদিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। যারা দুর্বল রয়েছে তাদের উচিত তারা যেন দুর্বলদের প্রভাব গ্রহণের পরিবর্তে জামাতের সাথে যাদের দৃঢ় সম্পর্ক আছে এবং যারা রীতিমত নামাযও পড়ে তাদের প্রভাব গ্রহণ করা। বন্ধু বান্ধব মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে আর বুদ্ধিমান তা কিভাবে বুঝতে পারে যে আমার ওপর অন্যের প্রভাব পড়ছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, একবার জালিনুস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন এক উন্মাদ ব্যক্তি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। যখন সে জালীনূসকে ছাড়ে তখন তিনি বলেন যে, আমার রক্তমক্ষণ কর অর্থাৎ রগ ছিদ্র করে তা থেকে রক্ত বের কর। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি রক্তমক্ষণ কেন করাতে চান? তিনি বলেন, এই যে উন্মাদ আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, আমার মনে হচ্ছে যে, আমার ওপরও উন্মাদনার কোন প্রভাব রয়েছে কেননা সে অন্যদেরকে বাদ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার এমন মনে হচ্ছে যে, আমার মাঝেও উন্মাদনার কোন উপকরণ রয়েছে যার সাথে এই উন্মাদ সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছে এবং সে আমার দিকে ছুটে এসেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এমন মানুষ বা লোকদের পিছনে চলা বা তাদের সাথে চলাফেরা করা যারা নামাযী নয় বা যারা নামাযে অলস, এটি থেকে বুঝা যায় যে, এদেরও অলসদের সাথে সামঞ্জস্য আছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৩৪৯)

সুতরাং সাধারণভাবে সর্বত্র সব আহমদীর অলসদের সাথে যোগাযোগ রাখার পরিবর্তে জামাতের মাঝে যারা সক্রিয়, কর্মঠ এবং আন্তরিক তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত বা সামঞ্জস্য স্থাপন করা উচিত। আর এই সামঞ্জস্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মঠ লোকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে যারা অলস আছে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে এক ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, আমি নির্দশন দেখতে চাই, যদি আমাকে অমুক নিদর্শন দেখানো হয় তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, আমার মনে আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে তাকে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন ভেলকিবাজ নন, তিনি কোন তামাশা দেখান না বরং তাঁর প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি আমাকে বলুন যে, পূর্বে যে সমস্ত নির্দশনাবলী দেখানো হয়েছে সেগুলোকে আপনি কতটা কাজে লাগিয়েছেন যে, এখন আপনার জন্য নতুন মু'জিযা বা নিদর্শন দেখানো হবে। কিন্তু মানব প্রকৃতির দুর্বলতা এটিকে অপছন্দ করে বরং এটিকে সে সভ্যতা বিবর্জিত আচরণ মনে করে, সে মনে করে যে, আলস্য এবং উদাসীনতায় নিপতিত থাকা বৈধ বরং সে স্থায়ীভাবে এই অবস্থায়ই নিপতিত থাকতে চায়। সে এটি চায় না যে, কেউ তাকে এই প্রশ্ন করুক যে, সে নিজের দায়িত্ব কতটা পালন করেছে। কিন্তু সে যখন কোন তামাশা দেখতে চায় তখন তাকে যেন তা দেখানো হয় এটিই তার দাবি।

(আনোয়ারুল উলুম, ১৪ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৭-২৭৮)

এটি হলো মানব প্রকৃতি। নাছোড় বা হঠকারীদের এমন আচরণ চিরাচরিতভাবেই চলে আসছে, না মানার হলে তারা শয়তানের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। সব নবীদের একই প্রশ্ন করা হয়েছে, এমনকি মহানবী (সা.)-কেও। অস্বীকারকারীরা তাঁর কাছে এমনই দাবি-দাওয়া পেশ করেছে যে, স্বর্ণের ঘরের মু'জিযা দেখান, আকাশে আরোহণের নিদর্শন দেখান, শুধু তাই নয় বরং আকাশ থেকে আমাদের সামনে কোন বই নিয়ে আসুন, আর এভাবে আজেবাজে প্রশ্ন করতে থাকে। সুতরাং খোদা তা'লা এমন বাজে দাবি-দাওয়াকে কোন গুরুত্বই দেন না, তাঁর নবীরাও এগুলোকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেন না। অগণিত নিদর্শনাবলী রয়েছে, মানতে হলে এক নেক প্রকৃতির মানুষের জন্য তাই যথেষ্ট।

কতিপয় ব্যক্তি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে কিছু আপত্তি করে যে, এটি আবার কোন নতুন স্কীম আরম্ভ করা হলো। এর উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, সত্যিকার অর্থে আমার এই তাহরীকে জাদীদের তাহরীক নতুন কোন তাহরীক নয় বরং এটি এক প্রাচীন তাহরীক আর জাদীদ বা আধুনিক শব্দের মাধ্যমে সেই সকল পক্ষাঘাত এবং রোগাক্রান্ত মাথার মোকাবেলা করা হয়েছে যারা জাদীদ বা আধুনিক ছাড়া অন্য কোন কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয় না। যেভাবে ডাক্তার যখন দীর্ঘদিন যাবৎ কোন রোগীর চিকিৎসা করে তখন সেই রোগী অনেক সময় বলে যে, এই ঔষধে আমার কোন কাজ হয় না। তখন ডাক্তার বলেন যে, আমি আজকে তোমাকে নতুন ঔষধ দিচ্ছি, এটি বলে নতুন ঔষধে অন্য কিছু মিশিয়ে দেয়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি (রা.) বলেন যে, টিংচার কার্ডিমাম মিশিয়ে কিছু ঔষধকে সুগন্ধিযুক্ত করে তোলা হয়, আর রোগী মনে করে যে, আমাকে নতুন ঔষধ দেওয়া হয়েছে। আর ডাক্তারও নতুন ঔষধ শব্দটি ব্যবহারের অধিকার রাখে কেননা সে ঔষধের সাথে আরেকটি ঔষধ মিশিয়ে এমন করে। কিন্তু এটিকে সে নতুন বানায় এজন্য যে, রোগী যেন তা পান করা অব্যাহত রাখে এবং সে যেন নিরাশ না হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এক বৃদ্ধা আসে, তার দীর্ঘ দিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, কোনভাবেই সেই জ্বর নামছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তুমি কুইনিন খাও। সেই মহিলা বলে যে, কুইনিন? আমি তো কুইনিন ট্যাবলেটের এক চতুর্থাংশ খেলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ জ্বরে ভুগতে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দেখলেন যে, এই মহিলা কুইনিন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় তখন, আমাদের দেশে যেহেতু সচরাচর কুইনিনকে কোনাইন বলে আর কোনাইন শব্দের অর্থ হলো দুই জগৎ অর্থাৎ ইহ এবং পর জগৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে খাওয়ার জন্য কুইনিনই দেন কিন্তু বলেন যে, এটি দারাইন এর ট্যাবলেট, এটি ব্যবহার কর। কোনাইন এবং দারাইন উভয় শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ দুই জগৎ। এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা বলেননি যে, এটি কুইনিন নয় বরং তিনি শুধু এর নতুন নাম রেখেছেন। এরপর সেই মহিলা হয়তো দুই তিনটি ট্যাবলেটই খেয়ে থাকবে এবং এসে বলে যে, এই ঔষধে আমার জ্বর নেমে গেছে। আমাকে আরো কিছু ট্যাবলেট দিন।পূর্বে বলতো যে, অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ট্যাবলেটও যদি খাই জ্বর নামে না, শরীর গরম থাকে, আর এখন নাম পরিবর্তন করে দিতেই শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে অর্থাৎ সব জ্বর নেমে গেছে। তিনি (রা.) বলেন যে, আমিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মত পুরনো এক তাহরীকের নাম তাহরীকে জাদীদ রেখেছি আর তোমরা বলছো যে, জাদীদ কেন রাখা হল বা নতুন করে তাহরীকের প্রয়োজন কি। আধ্যাত্মিকতার

ক্ষেত্রে উন্নতি যাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা নতুন তাহরীকের কথা শুনে বলে যে, আস এটি একটি নতুন তাহরীক, চল আমরা এটি থেকে উপকৃত হই, কিন্তু যাদের মাঝে কপটতা ও মুনাফেকাত ছিল তারা বলা আরম্ভ করে যে, ইনি এখন নতুন নতুন কথা আবিষ্কার করছেন আর মুহাম্মদ (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। সেকথা বুঝারও চেষ্টা করেনি আর লাভবান বা উপকৃতও হয়নি।

(আনোয়ারুল উলুম, ১৪ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০-২৩১)

অতএব এটি এক রীতি যা সব সময় বা আদি থেকে চলে আসছে বা আদমের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে যে, শয়তান যখন তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তখন শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোমাকে কোন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। শয়তানকে এড়িয়ে ধর্মের কাজে উন্নতির জন্য যখনই কোন পন্থা বের করা হবে এটি আসলে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে যেই উদ্দেশ্যে নবীরা এসেছেন আর যে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) এসেছেন আর যার জন্য এ যুগে তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন। যে কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর জামাতের সামগ্রিক উন্নতি বা অগ্রগতির জন্য দায়িত্ববান ব্যক্তিদের অব্যাহতভাবে বা অনবরত চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে তা তরবিয়তের কাজ হোক বা অন্য যেকোন কাজই হোক না কেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক ফকির ছিল যে প্রায় সময় সেই কক্ষের সামনে যেখানে পূর্বে একাউন্টিং অফিস ছিল সেখানে বসে থাকত। আহমদীয়া চক থেকে কোন ব্যক্তিকে আসতে দেখলেই সে বলতো যে, এক রুপিয়া দাও। এরপর সেই ব্যক্তি আরো কিছুটা এগিয়ে আসলে সে বলতো যে, আট আনা দাও। এরপর আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সে বলতো যে, আচ্ছা চার আনা দাও বা সিকি দাও। এরপর তার সামনে এসে গেলে বলতো যে, দুই আনা দাও। এরপর তাকে অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো যে, এক আনাই দাও। আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে বলতো যে, অন্তত পক্ষে এক পয়সাই দাও। আরো কিছুদূর গেলে বলথো যে, আধা পয়সাই দাও। সেই ব্যক্তি যখন সেই মোড়ের কাছে পৌঁছে যেত যেখানে মসজিদে আক্বসার মোড় তখন সে বলতো যে, একটি পাকোড়াই দিয়ে দাও। এরপর সে যখন দেখতো যে, গলির শেষ কোণায় পৌঁছে গেছে তখন বলতো যে, অন্তত একটা মরিচই দাও। অর্থাৎ সে রুপিয়া থেকে আরম্ভ করে মরিচে এসে শেষ করত। অনুরূপভাবে যারা কাজ করে বা যারা কর্মী তাদেরও এটি ভাবা উচিত যে, অন্তত পক্ষে কিছু তো হস্তগত হওয়া চাই। একশ' এর ভিতরে প্রথমে যদি এক জনের প্রতি যদি দৃষ্টি দেয় তাহলে পরের বার দু'জন হয়ে যাবে, এর পরের বার চারজন হয়ে যাবে আর এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং কাজ কর আর এরপর ফলাফল দেখ, জাগতিক কাজকর্ম যেখানে ফলাফল শূন্য হয় না সেখানে এটি কিভাবে ভাবা যেতে পারে যে, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কাজ ফলাফল শূন্য থাকবে? কিন্তু যাদের হৃদয় কলুষিত তারা বলে যে, আমরা কাজ করি কিন্তু ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে। ফলাফল অবশ্যই আল্লাহ্‌র হাতে, তাদের কথার অর্থ হলো আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পুরো পরিশ্রম করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা শত্রুতা প্রকাশ করেছেন বা শত্রুতা দেখিয়েছেন। এটি বলা কত বড় নির্বুদ্ধিতা, নিজেদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য খোদা তা'লাকে দায়ী করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার নীতি হলো আমরা যে কাজ করি সেই কাজের কোন না কোন ফলাফল অবশ্যই প্রকাশ পায়। কিন্তু ফলাফল ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে আমাদের নিজেদের কাজের ওপর, কোন ব্যক্তি এক দশমাংশ পরিশ্রম করলে প্রকৃতির আইন হলো, তার ফলাফলও এক দশমাংশই প্রকাশ পাবে। এখানে দশমাংশের অর্থ এটি নয় যে, প্রকৃতির নিয়মের কারণে এমনটি হয়েছে নতুবা পরিশ্রম তো সে বেশি করেছিল। প্রকৃতির নিয়ম কারো পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেয় না কিন্তু দুস্কৃতকারী ব্যক্তি বলে যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন নি আর ভুলে গেছেন এর চেয়ে বড় কুফরী বাক্য আর কি হতে পারে? সুতরাং শ্রম ও সাধনার যতটুকু সম্পর্ক আছে ফলাফল আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে, যদি ফলাফল ভালো না হয় তাহলে নিশ্চিত হতে পার যে, আমাদের কাজে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে।চেষ্টা করা উচিত যেন সব কাজের ফলাফল সুনির্দিষ্ট রূপে আমাদের সামনে আসে, ফলাফল যতদিন সামনে না আসে আমাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

(আনোয়ারুল উলুম, ১৮ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১-২০২)

কিছু মানুষ লিখে যে, আমরা অনেক ইবাদত করেছি, অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয়নি, দোয়া গৃহিত হয়নি। তাদেরও এটি বুঝতে হবে যে, যতটা যাওয়া উচিত ছিল তারা হয়তো সেখানে পৌঁছেনি বা গন্তব্য নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তারা ভুল রাস্তা বেছে নিয়েছে। এক দোয়াকারী ব্যক্তির এটি নিয়ে ভাবা উচিত যে, রাস্তাও যেন সঠিক হয় আর যতটা পরিশ্রম করা প্রয়োজন তাও যেন করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, এক রসায়নবিদ যখন ব্যর্থ হয় তখন সে বলে যে, এক লাইন বা এক বিন্দুর ঘাটতি রয়ে গেছে অর্থাৎ রসায়নবিদ হওয়ার বিষয়ে সে নিরাশ হয় না বরং নিজের ত্রুটির কথাই স্বীকার করে অথচ রসায়নবিদ হওয়ার ক্ষেত্রে আশা করার বা ভুল ত্রুটির কোন সুযোগ নেই আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে তো সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের পুরো আশা থাকে। এক রসায়নবিদ যার সারা জীবন সামান্য ঘাটতি বা ভুল-ত্রুটির মাঝে কেটে যায়, সে কখনও সফলতার বিষয়ে নিরাশ হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্য চায় আর সফলতা পায় না সে এর জন্য নিজের কর্মপন্থার ত্রুটিকে দায়ী করে না বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিরাশ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং নিজের চেষ্টা প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। সুতরাং এক রসায়নবিদ তো ভুল-ত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, স্বর্ণ অবশ্যই বানাতে সক্ষম হব কিন্তু যে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা করে সে নিজের ভুল-ভ্রান্তিকে খোদার প্রতি আরোপ করে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দেয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১১ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০)

আজকালকার গবেষকদের অবস্থাও একই, বছরের পর বছর একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য গবেষণা করে, বছরের পর বছর তাতে ব্যায় করে এবং বহু বছর পর তাতে সাফল্য আসে আর তাতেও যে রীতি তারা একবার অবলম্বন করে সর্বদা সেই রীতিই অবলম্বন করা আবশ্যক নয়, বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন ধরণের রীতি অবলম্বন করা হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিকতা অর্জন এবং খোদার নৈকট্য লাভ আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য নিজের রীতি এবং পন্থা দেখতে হবে, নিজের সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, আত্মসংশোধন করতে হবে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, কিভাবে আত্মসংশোধন করা হচ্ছে, নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে, নিজের ইবাদতের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। খোদা তা'লার সকল আদেশ নিষেধ অনুসারে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। নিজের প্রতিটি কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমাদের কর্মের মান কেমন, নিজেদের চিন্তাধারা এবং যুক্তি বুদ্ধির সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলেন যে, আমি বান্দার কাছে অবস্থান করি এবং তাদের দোয়া গ্রহণ করি, তারপরও যদি তিনি কাছে না আসেন আর দোয়া গৃহিত না হয় তাহলে কোন না কোন ক্ষেত্রে বা কোন স্থানে অবশ্যই আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি আছে এবং ব্যবহারিক অবস্থায় কোন দুর্বলতা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, 'গাদা' অর্থাৎ ফকির বা ভিক্ষুক দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক ধরণের ফকির হলো 'নারগাদা' আর দ্বিতীয় প্রকার ফকির হলো 'খারগাদা'। 'নারগাদা' ফকির হলো সে যে কারো দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে যে, কিছু দাও। তখন কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করে আর না দিলে দুই তিন বার ডেকে চলে যায়। কিন্তু 'খারগাদা' ফকির সে যে যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সেখান থেকে সরে না। এমন ফকির কিছু না নেয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না, কিন্তু এমন ফকির খুব কমই হয়ে থাকে। আমার মনে আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বসে থাকত আর সে ততক্ষণ উঠতো না যতক্ষণ কিছু হস্তগত না করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যতক্ষণ বাইরে এসে তাকে কিছু না দিতেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকত। অনেক সময় সে পয়সা নির্ধারণ করত যে, এত টাকা নেব। যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেয়ে কম দিতেন সে নিত না। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, অতিথিরা তার উদ্দিষ্ট অংক তাকে দিয়ে দিত যাতে সে চলে যায়। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি তার মুখ থেকে যদি এমন কোন কথা বের হতো যে এত টাকা নিব তাহলে যতক্ষণ সেটি পুরো না হত সে যেত না। হুযূর (আ.) অসুস্থ থাকলে সে ততক্ষণ যেত না যতক্ষণ হুযূর সুস্থ্য হয়ে বাইরে না আসতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, দোয়া গৃহিত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো মানুষের 'খারগাদা' ফকির হওয়া আর চাইতে থাকা, আল্লাহ্‌র দরবারে ধরনা দিয়ে বসে থাকা আর বিচ্যুত না হওয়া যতক্ষণ খোদার কর্ম এটি প্রমাণ না করে যে, এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০০)

আল্লাহ্ তা'লার কর্ম যে, এখন আর এর জন্য দোয়া করা উচিত নয়, এটি কয়েকভাবে সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক মহিলা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকে,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,7 April 2016 Issue No. 5

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এটি বোঝা যায় যে, মেয়ে হতে যাচ্ছে নাকি ছেলে আর শেষ সময় এসে এটি পরিষ্কারভাবে বোঝায় যায় যে, ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। তখন এটি বলা যে, ছেলেই হোক, এটি খোদার কর্মের পরিপন্থী আচরণ, এটিতো জন্মের একান্ত পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ গর্ভকালের একেবারে শেষ সময়, তবে হ্যাঁ, পরবর্তী গর্ভধারণের জন্য এই দোয়া গৃহীত হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন পরবর্তীতে ছেলে সন্তান দান করেন। অথবা কখনও যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তারপরও যদি মানুষ দোয়া করতে থাকে তাহলে এটিও ভ্রান্ত রীতি, এটি শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ। কিন্তু এখানে এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, কখনোই তদবীর বা চেষ্টা প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। অবিচলতার সাথে চেষ্টা এবং দোয়া করে যাওয়া খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে, তাই চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে দোয়া একান্ত আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, দোয়ার সাথে চেষ্টাপ্রচেষ্টা না করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি। এমন ব্যক্তির দোয়া তার মুখে ছুড়ে মারা হয় যে কেবল দোয়া করে কিন্তু কোন চেষ্টা করে না। যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়াকে এক সাথে না রাখে তার দোয়া গৃহীত হয় না কেননা দোয়ার সাথে চেষ্টা না করা খোদার আইন লঙ্ঘন করা এবং তাঁর পরীক্ষা নেয়ার নামান্তর আর বান্দা আল্লাহ্র পরীক্ষা নিবে এটি খোদার মহিমা পরিপন্থী একটি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবিচলতার সাথে এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খোদার সন্তুষ্টি অনুযায়ী বানিয়ে সকল বাহ্যিক উপায় উপকরণ অবলম্বনের মাধ্যমে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি এক শহীদের জানাযা। তিনি হলেন মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব, পিতার নাম জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, তিনি শেখুপুরা জেলার কোট আব্দুল মালেক-এর অধিবাসী। গত ১লা মার্চ ২০১৬ তারিখে ঘরের বাইরে ছুরি মেরে বা ছুরিকাঘাত করে বিরোধিরা তাকে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন। ঘটনার দিন শহীদ মরহুম কামরুয্ যিয়া সাহেব ঘরের সাথে সন্নিবেশিত দোকান বন্ধ করে বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে আনার জন্য ঘর থেকে বের হন, তখন দুই জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার ওপর হামলা করে তাকে টেনে গলিতে নিয়ে যায়, এক ব্যক্তি কামরুয্ যিয়া সাহেবকে চেপে ধরে আর দ্বিতীয় জন ছুরি দ্বারা তার ওপর হামলা আরম্ভ করে। কামরুয্ যিয়া সাহেব আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন কিন্তু তার বুক, কাঁধ, হৃৎপিণ্ড এবং ঘারে আঘাত আসে, এক আক্রমণকারী পিছন থেকে ঘারে ছুরিকাঘাত করে আর ছুরি সেই অবস্থায় রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তার বড় দাদা জনাব দৌলত খান সাহেবের মাধ্যমে আসে যিনি গুরুদাসপুর জেলার অলক বেরী থেকে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর রাবওয়ার বেহেশতী মাক্বেরায় তিনি কবরস্থ হন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব ফাতেহ মোহাম্মদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জন্মগত আহমদী ছিলেন, তিনিও রাবওয়ার বেহেশতী মাক্বেরায় কবরস্থ রয়েছেন। দেশ বিভাগের পর এই পরিবার হিজরত করে শিয়ালকোটের কালী ক্যানাগরেতে বসতি স্থাপন করে। শহীদ মরহুম সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৫ সনে কোট আব্দুল মালেকে স্থানান্তরিত হন। শহীদ মরহুম বি কম পাশ করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন চাকুরী করেন, তারপর ঘরের সাথে একটি দোকান খুলেন যেখানে ফটোস্ট্যাট এবং মোবাইল ফোনের দোকান দেন। ২০০৪ সনে তার বিয়ে হয়। বহু গুনাবলীর আধার ছিলেন, নেক, ঈমানদার, উত্তম চরিত্র, পবিত্র স্বভাব, মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ এবং সৎসাহসী যুবক ছিলেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। জামাতের কাজেও সবসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পলন করেছেন, সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। শহীদের ভাই মাযহার আলী সাহেব বলেন যে, মোটের ওপর নামায, বিশেষ করে জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন, রীতিমত তাকে জুমুআ পড়তে দেখে অন্যান্য অ-আহমদী দোকানদারও জুমুআর দিন তাদের দোকান বন্ধ করে জুমুআর জন্য যেতো এবং বলতো যে, যদি এক মির্যায়ী জুমুআর সময় দোকান বন্ধ করে যেতে পারে তাহলে আমাদেরও যাওয়া উচিত। এ কারণেও তিনি কোন সময় জুমুআর নামায পরিত্যাগ করতেন না যে, আমার কারণে অ-আহমদী মানুষরাও জুমুআর জন্য যায় বা জুমুআ পড়তে যায়।

তার স্ত্রী বলেন যে, গত মাস থেকে শহীদ মরহুমের আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, আর পূর্বের চেয়ে অধিক আমার যত্ন নেওয়া আরম্ভ করেন, কোন কথায় রাগ করতেন না। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন আর সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদের পদে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জামাতী পদে তিনি কাজ করেছেন এবং জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। সকল জামাতী কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তিনি অনেক দিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখিন ছিলেন। এই সম্পর্কে পুলিশ এবং প্রশাসনে লিখিত আবেদনও দেয়া হয়েছে। ২০১২ সনের ১৪ই আগষ্ট প্রায় পাঁচশত ব্যক্তির এক মিছিল পুলিশের তত্ত্বাবধানে কামরুয্ যিয়া সাহেবের ঘরের বাহিরে একত্রিত হয়, বিরোধীদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করে পুলিশ ওয়ালা দোকানের কাউন্টারে উঠে ছবি নামানো আরম্ভ করে আর দোকানের সাটারে লেখা 'ওয়াল্লাহুখায়রুর্ রাযেকীন' এবং কলেমা তাইয়্যেবার ওপর আলকাতরা লেপন করে। পরে দোকানের দেয়ালে ঝুলন্ত 'আ লাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহ্' এবং 'মা শাআল্লাহ্'র বোর্ড মাতুল দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঘরের বাইরের নেইমপ্লেট থেকে, যেখানে কামরুয্ যিয়া সাহেবের পিতার নাম মোহাম্মদ আলী লেখা ছিল, মোহাম্মদ অংশটি মাতুল দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। তো এই হলো এদের অবস্থা। এটি দেখে ইন্না লিল্লাহ্ পড়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। একই ভাবে ২০১৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী ৪০/৫০ জন মৌলভীর একটি মিছিল কামরুয্ যিয়া সাহেবকে জোর করে দোকান থেকে বের করে সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত করা ছাড়াও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবির অবমাননা এবং অসম্মান করে আর নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে থাকে, তখন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কামরুয্ যিয়া সাহেবকে থানায় নিয়ে যায় কিন্তু পরে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়েই এই বিষয়কে ধামাচাপা দেয়া হয়। তো এই হলো বিরোধিতাপূর্ণ চিত্র এবং অবস্থা।তাকে সব সময়ই হুমকি দেয়া হতো, আর এ কারণে তার বহিঃবিশ্বে চলে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন।

শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই ভাই এবং দুই বোন ছাড়াও পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেব, স্ত্রী রুবী কুমরসাহেবা, তিন সন্তান হুযায়ফা আহমদ যার বয়স ১০ বছর, কন্যা আমাতুল মতিন যার বয়স ৭ বছর এবং আরেক কন্যা আমাতুলহাদী যার বয়স ৪ বছর, তাদেরকে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই শহীদ ভাইয়ের মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে তার মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করা অব্যাহত রাখুন এবং জান্নাতের নিয়ামতে তাদেরকে ভূষিত করুন আর তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তদের মাঝে স্থান দিন। (আমীন)

দুয়ের পাতার পর...

ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত মৌলানা হাকিম নুরুদ্দীন (রাঃ) দ্বিতীয় কুদরতে প্রথম প্রকাশক রূপে নির্বাচিত হন। এই ভাবে তিনি পতনুন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। অভ্যন্তরীন কলহকে কঠোরতার সাথে দমন করেন। এবং আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক উভয় স্তরে জামাতকে সুদৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি (রাঃ) জামাতকে সম্বোধন করে বলেন,

"তোমরা শিষ্টাচার শিখ। কেননা, এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।"

(বদর, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১২)

তিনি (রাঃ) ১৩ই মার্চ ১৯১৪ সালে নিজ প্রিয় প্রভুর নিকট মিলিত হন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

(ক্রমশঃ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir